সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

৮ম বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২ | web: www.spbm.org | মূল্য ৭ টাকা

'কসমেটিক উন্নয়ন' চাই না!

কথা হচ্ছিল রাস্তার পাশের টং এর চা বিক্রেতা খালেদ চাচার সাথে। তার চোখে মুখে স্পষ্টত বিরক্তির ছাপ। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একরাশ বিক্ষুব্ধ শব্দমালা। দুপুর বেলা বাসায় গিয়েছিলেন। দু'মুঠো খেয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন বলে। বললেন, "গেছিলাম খাইতে। ২ ঘন্টা ধইরা কারেন্ট নাই। সারাদিন কাস্টমারের লগে ৫ টাকা না ৭ টাকা নিয়া গ্যাঞ্জাম কইরা বাসায় গিয়াও শান্তি নাই। দিনের বেলা ঘরটা আন্ধাইর। গরমে ঘামতে ঘামতে শ্যাষ। মনে হইলো দোজখে আছি।" কথা যেন তার শেষই হতে চায় না। বলতে থাকেন, "চাইল, ডাইল, তেলের দাম বাড়ছে। এহন আবার চিনির দাম বাড়ছে। রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা এখন কম আসে, কম খায়। কাস্টমার কইম্যা গেছে। সরকার কসমেটিক এর লাহান উন্নয়ন করে। 'কসমেটিক' লাগাইলে দেখতে হুনতে সুন্দর লাগে। কিন্তু পানি দিলে ধুইয়া সাফ।"

খালেদ চাচার কথা মনে ধরলো। সত্যি তো তাই! সরকারের এই উন্নয়ন কসমেটিক উন্নয়নই বটে! আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন খালেদ চাচাদের কাছে কসমেটিক উন্নয়ন হিসাবে দেখা দিয়েছে।

শতভাগ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন– এ দুটি ছিল আওয়ামী লীগের কথিত উন্নয়নের দৃশ্যমান মডেল, গালভরা প্রচার। বিদ্যুৎখাতে উন্নয়নের নমুনা আজ সকলের কাছে পরিষ্কার। একদিন সংসদে দাঁড়িয়ে যারা বিদ্যুৎ বিক্রি ৭ম পৃষ্ঠায়

ভোটডাকাত সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন নয়

গণবিরোধী শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে চাই গণজাগরণ

দেশের সাড়ে ৬ কোটি শ্রমিকের ৮৬ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত। তারা যে জায়গায় শ্রম দেন সেখানে কোন চুক্তিপত্র নেই। নির্দিষ্ট বেতন নেই। ছুটি নেই, বোনাস নেই, পেনশন নেই। তারা অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য সামান্য সঞ্চয়ের টাকা ভাঙতে হয়, আবার কাজ না করতে পারার কারণে সেই দিনের উপার্জনটাও যায়। যারা চাকরি করেন, স্থায়ী আয় আছে, তারাও ভালো নেই। সম্প্রতি ডব্লিউএফপি'র প্রতিবেদনে এসেছে– এ বছরের আগস্ট মাসে পরিবারের খাদ্য কেনার জন্য দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়েছেন। ২৯ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙেছেন। এর মধ্যে ১০ শতাংশ পরিবার তাদের ১২ মাসের সব সঞ্চয় ভেঙে ফেলেছেন।

এই অবস্থার মধ্যেই আসছে নির্বাচন। গত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেননি। দেশের মানুষের মনে ভোটাধিকার হারানোর জ্বালা আছে, সাথে যুক্ত হয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। সরকারি সকল অফিসে, পাড়া-মহল্লায়, ব্যবসাক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দৌরাত্ম ও চাঁদাবাজিতে সাধারণ মানুষের জীবন অতীষ্ঠ। গোটা দেশে আওয়ামী মাফিয়াতন্ত্র কায়েম হয়েছে। চাকরি থেকে ব্যবসা, বিয়ে কিংবা কুলখানি– কোন কিছুই আওয়ামী মাফিয়াতন্ত্রের মতামত ও তাদেরকে হিস্যা দেয়া ব্যতিরেকে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এই সকল কারণে দেশের মানুষের মধ্যে তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব আছে। নির্বাচনকে ঘিরে তাই জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। ভোটের অধিকারের সাথে সাথে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবিও এসেছে রাজনীতির মাঠে। এগুলো কোনটাই ফেলে দেয়ার নয়। সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার দূর করার জন্য সাংবিধানিক সংস্কারও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতকিছুর পরেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আওয়ামী লীগের পতন ও একটা সুষ্ঠু নির্বাচন কি মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে? সংবিধান সংশোধন করে কি রুখে দেয়া যাবে বুর্জোয়া দলগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতায় টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা?

নির্বাচনী ব্যবস্থা একটা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো

দুনিয়াতে নির্বাচন ও সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা তখন দেখা দিয়েছিলো। সামন্ত অর্থনীতি ভেঙে যখন পুঁজিবাদের জন্ম হয়, অর্থনীতিতে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থান ছিলো। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলো অবাধ প্রতিযোগিতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অবাধ প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্ম দেয়। কিন্তু কালক্রমে ঐতিহ্যবাহী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর পার হয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম হয়। এ পর্যায়ে পুঁজিবাদ তার প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এই সকল দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি অনুন্নত দেশগুলোতে খাটানো শুরু করে। শুরু হয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মাধ্যমে অনুন্নত দেশের সস্তা শ্রম শোষণ। মহান লেনিন একে বলেছেন, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর– সাম্রাজ্যবাদ। অর্থনীতির এই পরিবর্তনের প্রভাব উপরিকাঠামোয়ও প্রভাব ফেলে। বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলোর পার্লামেন্টেও পরিবর্তন আসে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টগুলো পরিণত হয় দ্বি-দলীয় পার্লামেন্টে, বহুদলীয় ব্যবস্থা লুপ্ত হয়। বাইরে থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচনটা ঠিকঠাকই হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে সেটি অন্তঃসারশূণ্য। বড় দুই দলের বাইরে কোন দলের জেতা তো দূরের কথা, প্রচারে ভোটারদের সামনে আসারও কোন উপায় নেই। ২য় পৃষ্ঠায়

জমি, ঘর ও রেশনের দাবিতে

রংপুরের ভূমিহীনরা লড়ছে

শহরে চলার পথে এই মানুষগুলোকে আমরা সবসময় দেখি। তারা কেউ ভ্যান চালায়, কেউ মজুর খাটে, কেউ মুট বয়। কেউ কাজ করে অবস্থাপন্নদের ঘরে, গৃহপরিচারিকা হিসেবে। তারা গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন। অনেকেই নিজেদের জায়গা-জমি হারিয়েছেন অনেক আগেই। নিঃসম্বল অবস্থায় পাড়ি জমিয়েছেন শহরে, একটা কাজের আশায়। এরা ছিন্নমূল, ভূমিহীন মানুষ।

রংপুর শহরের এরকম হাজার হাজার ভূমিহীন মানুষ লড়াই করছেন প্রায় দুই যুগ ধরে। তাদের দাবি শহরের খাস জমি ভূমিহীনদের বরাদ্দ দিতে হবে। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হয় এই আন্দোলন। সে সময়ের জেলা প্রশাসক বলেছিলেন যে, শহরে দেয়ার মতো জায়গা নেই। তখন রংপুরের 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন' এর পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন খাস জমি চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এই লড়াই সে সময় থেকেই চলমান। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, 'কোন মানুষই ভূমিহীন থাকবে না।' কিন্তু এর কোন বাস্তবায়ন নেই। এগুলো কথার কথা হিসেবেই থেকে গেছে। সরকারি খাস জমি প্রভাবশালীদের দখলে। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্বল কিছু ঘর বানিয়ে লোক দেখানো কর্মসূচী পালন করা ছাড়া কিছুই হয়নি।

নিরতিশয় কষ্টে আছে ভূমিহীন, গৃহহীনরা।

দীর্ঘদিন ধরে চলা এই আন্দোলনের নেতৃত্বকারী সংগঠন 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন' তখন রংপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থিত ভূমিহীনদের তালিকাসহ জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গঠিত হয় ভূমিহীনদের নিয়ে কমিটি। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০টি ওয়ার্ডে ২৩টি কমিটি আছে ভূমিহীনদের। সর্বশেষ গত ৩১ অক্টোবর রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও ভূমিহীন নেতা কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু। বক্তব্য রাখেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ, বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব আহসানুল আরেফিন তিতু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সংগঠক অ্যাডভোকেট কামরুন্নাহার শিখা প্রমুখ।

জনসভা থেকে সরকারি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন, বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমিহীনদের বরাদ্দ, ভূমিহীনদের আর্মিরেটে রেশন প্রদান, ভূমিদস্যুদের দখল থেকে সরকারি খাসজমি উদ্ধারসহ ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়। দাবি পূরণ না হলে আগামী সংসদ অধিবেশনের সময় সংসদ অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেয়া হয়।

১ম পৃষ্ঠার পর

নিরপেক্ষ তদারকি সরকার

বিশ্ব পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্ম। এই দেশ স্বাধীন করতে দেশের সাধারণ মানুষের অশেষ ত্যাগ ও আত্মদান থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেহেতু তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি পুঁজিপতিদের দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়, সেহেতু দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আসলো, কিন্তু মুক্তি আসলো না। পুঁজিবাদের এই প্রতিক্রিয়াশীল যুগে বাংলাদেশের পুঁজিবাদের চরিত্র খুব বিপ্লবাত্মক হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে অবশ্যম্ভাবী উপজাত হিসেবে লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ শুরু হয়। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এর আগে ও পরে সমস্ত রকম নীতিবর্জিত কর্মকাণ্ড।

বাংলাদেশে নির্বাচনের ইতিহাস– দুর্বৃত্তায়নের ইতিহাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কাঠামোয় অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের শেষ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে নির্বাচিত লোকদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়, এই গণপরিষদে ১৯৭২ এর সংবিধান পাস হয়। সেই সরকারের অধীনে স্বাধীন দেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। আওয়ামী লীগ তখন স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বকারী দল আর শেখ মুজিবর রহমান তখন দেশের অবিসংবাদিত নেতা। আওয়ামী লীগের এ নির্বাচনে জয় নিশ্চিত ছিলো। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিতও হয়েছিলো। কিন্তু তারপরও ১৫টি আসনে আওয়ামী লীগ মারদাঙ্গা, এজেন্ট হাইজ্যাক ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায়।

১৯৭৭ সালে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান তার শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করেন। এই নির্বাচনে কোন বিরোধী পক্ষ ছিলো না। ভোটের কিছুদিন আগে জিয়াউর রহমান তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে সরিয়ে দিয়ে নিজে রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৭ সালের এই গণভোট ছিলো তার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য। ভোটের ব্যালটে লেখা হয়– 'রাষ্ট্রপতি হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের উপর আপনার আস্থা আছে কিনা?' এর উপর ভিত্তি করে ভোটারদের 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দিতে হবে। নির্বাচনের পর সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, নির্বাচনে ৯০ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি ছিলো আর জিয়াউর রহমানের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৯৯ শতাংশ। প্রায় খালি ভোটকেন্দ্রগুলো যখন মানুষ দেখেছেন তখন ৯০ শতাংশের উপস্থিতি দেখানোটা এতটাই অতিরঞ্জিত ছিলো যে সেটি দেশ ও বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরপর ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কিংবা ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন–সবকিছুই ছিলো জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য। ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের পর জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পরের জাতীয় সংসদ ছিলো সর্বাপেক্ষা বিরোধী দলে সজ্জিত সংসদ। কিন্তু সেটাও অবাধ ও সুষ্ঠু ছিলো না। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পর বিএনপির অনেক প্রার্থী অভিযোগ করেন যে তাদেরকে হারিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদের আসন দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজের জয় নিশ্চিত করে সংসদটি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেখানোর জন্যই এই সংসদে এত বিরোধীদলের সমাহার ছিলো। এরপর থেকে জিয়াউর রহমানকে বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে প্রচারে নিয়ে আসে। যদিও সবকিছুই ছিলো পরিকল্পনারই অংশ।

স্বৈরাচারী এরশাদের অধীনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এরশাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্যই এই নির্বাচন। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের অধীনে ১১ ফেব্রুয়ারি ও আওয়ামী লীগের অধীনে ২০১৪ সালের নির্বাচন ছিলো একপাক্ষিক। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু সেই নির্বাচনের রিগিং ছিলো দেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। নির্বাচনের আগের দিন রাতে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই ব্যালটবাক্স ভর্তি করে দেন। ১৯৯১, ১৯৯৬ কিংবা ২০০৮ সালের নির্বাচন আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও টাকা, পেশিশক্তি ও মিডিয়ার প্রভাব ছিলো প্রাধান্যে।

শুধু নির্বাচনের দিন কারচুপি কিংবা ভোট ছিনতাই নয়, নির্বাচনের আগে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংও এই সংসদীয় গণতন্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছে। সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগ যেমন তথ্য সচিব ও পুলিশের দুজন এসপিকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছেন, নির্বাচনের আগে পুরো মাঠ প্রশাসনকেই ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছে, ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বিএনপি আমলেও। ২০০২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৪৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও ৩৮ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন হওয়ার পর ক্ষমতাসীন সকল দলই চেষ্টা করেছেন যেকোন উপায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে নিজের দলীয় লোকের আসার ব্যবস্থা করতে। সেজন্য বিচার বিভাগে প্রয়োজনীয় রদবদল করেছেন, আইন সংশোধন করেছেন, এমনকি প্রধান বিচারপতির অবসরের সময়সীমা পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে সাথে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছে, আবার এখন বিএনপিকেই যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন প্রনয়ণের পর আওয়ামী লীগ এটাকে লড়াই করে গণতন্ত্রের পক্ষে আনা একটা বড় জয় বলে আখ্যায়িত করেছে, এর সমস্ত ক্রেডিট দাবি করেছে। আবার নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বাতিল করেছে। বিএনপি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলো তাদের ২০০০ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত শাসনামলে, 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' এর মধ্য দিয়ে। আর আওয়ামী লীগ এখন রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে তালিকা করে বিরোধীদের হত্যা করছে। দুর্নীতি-দুঃশাসনে এরা কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। তারা বিরোধী দলে অবস্থানকালীন সময়ে গণতন্ত্র আর সরকারে থাকলে উন্নয়নের ঝাণ্ডাবাহী। মিথ্যার পর মিথ্যা বলা আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তাদের ঐতিহ্য।

তাই সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন, সামরিক সরকারকে বৈধতা দেয়ার নির্বাচন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন– যে ধরনের নির্বাচনই হউক না কেন, এর মধ্য দিয়ে জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। তারা এক স্বৈরাচারীর হাত থেকে আরেক স্বৈরাচারের হাতে পড়বে। ফুটন্ত কড়াই থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য লাফ দিয়ে পড়বে জ্বলন্ত চুলায়।

আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাবই বিএনপির শক্তির উৎস

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল বাদেও বিএনপি দুই দফায় শাসনক্ষমতায় ছিলো। যে সকল নীতিগত সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে নেয়া হয়েছে তার সবকিছুই বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে বহাল ছিলো। বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশ পরিচালনা, বহুজাতিক কোম্পানির হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেয়া, ভারতের সাথে বাংলাদেশের পক্ষে অপমানজনক পররাষ্ট্রনীতি বহাল রাখা, ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাট, তারেক রহমানের নেতৃত্বে হাওয়া ভবনে সিভিল প্রশাসনের সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলা ও এই কেন্দ্র থেকে মাফিয়াতন্ত্র পরিচালনা করা– সবই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার করেছে। তাদের ভোটের স্লোগানও অভিন্ন। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টি সকল দলই ভোটের সময় পাল্লা দিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে। সবাই ভোটের আগে জনগণকে কম খরচে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি আর কৃষককে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় বেকারকে চাকরি দেয়ার। এই দলগুলো এই একটা জিনিসই সত্যিকার অর্থে জনগণকে দেয়, সেটা হলো প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতায় যাওয়ার পর যে শ্রেণি তাদেরকে ক্ষমতায় এনেছে, সেই ব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থেই সকল রকম নীতি ও পরিকল্পনা তারা প্রনয়ণ করে। দল ও দলীয় নেতাকর্মীরা সেই সকল ব্যবসার কমিশন পায়, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের টাকা লুটপাটের ভাগ পায়। এর কোন ব্যত্যয় নেই। জনগণ তা জানেন।

কিন্তু কোন শক্তিশালী বিকল্প না থাকায় জনগণের আওয়ামী বিরোধী ক্ষোভকে বিএনপি পুঁজি করতে পেরেছে। এই সমর্থন বিএনপির রাজনীতির প্রতি সমর্থন নয়। বিএনপি আন্দোলন আন্দোলন ভাব দেখানোর জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ বেশকিছু জনপ্রিয় ইস্যুকে তাদের সভাগুলোর দাবিনামায় রেখেছিলো। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই কালক্রমে আলোচনার ভরকেন্দ্র এসব দাবি থেকে সরে গিয়ে আওয়ামী লীগ পতনের এক দফাতে গিয়ে ঠেকেছে। যারা রাজনীতি সচেতন, তারা একথাটা খুব পরিস্কারভাবেই বুঝেন যে, একদলকে সরিয়ে আরেক দলকে ক্ষমতায় আনলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

নির্দলীয় তদারকি সরকার কি সাংবিধানিকভাবে এখন সম্ভব নয়?

নির্বাচন সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি মোহ এখনও যায়নি। যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা হিসাবে এখনও বুর্জোয়া দলগুলোর বিকল্প হিসেবে বামপন্থী দলগুলো দাঁড়াতে পারেনি। আবার বামপন্থী দলগুলো প্রভূত শক্তি অর্জন করলেও যতক্ষণ না জনগণ সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে নামছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনের ভূমিকা রাষ্ট্রে থাকবেই। বাংলাদেশে বারবার তৈরি হওয়া শাসনতান্ত্রিক এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের দাবি এসেছে। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে তাদের পালিত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে যে, যা সংবিধানে নেই, সেই দাবি রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে করছে। তাদের মনে রাখা দরকার যে, এরশাদ পতনের পর তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে যখন বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, তখনও তা সংবিধানসম্মতভাবে হওয়ার পথ ছিলো না। রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেই তা করা হয়েছিলো। উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ তখন পদত্যাগ করেছিলেন, তার স্থলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এরপর এরশাদ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন উপরাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন। তিনি তখন তিন জোটের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়োগ দেন। ফলে রাজনৈতিক সমঝোতা হলে সংবিধান সংশোধন না করেও নিরপেক্ষ তদারকি সরকার গঠন করা যায়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে এটা চাইছে না। অনাবশ্যকভাবে সংবিধানের অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে।

নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ সাংবিধানিক সংশোধন এখন সময়ের দাবি

বাংলাদেশে দল ও গোষ্ঠীস্বার্থে সংবিধান কাঁটাছেড়া ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করলে এটা অনস্বীকার্য যে, এটি কোন শাশ্বত বিধান নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান কোনদিন শাশ্বত হতে পারে না। সময়ের প্রয়োজন অনুসারে এটি পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার সংকট পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট, একথা সত্য। আবার এই শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি বামপন্থী দলগুলোকেও করতে হয়। এটা করতে হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই। এ কারণে বাম গণতান্ত্রিক জোটের আত্মপ্রকাশের সময়ই সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল, নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক কাঠামোগুলোর স্বাধীন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা সাজানোসহ বেশকিছু সাংবিধানিক কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি তোলা হয়েছিলো। বামজোটের বাইরেও কিছু দল ও সংগঠন এই দাবিগুলো বেশ জোরালোভাবেই তুলেছে। এই দাবিগুলো বাস্তবায়িত হলেই শাসনব্যবস্থার সংকট দূর হয়ে যাবে এটা আমরা মনে করি না। কারণ সংকট সংবিধানের মধ্যে নেই, সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে। সংবিধানে উজ্জ্বল কালিতে লিখে দিলেও, ঢাক বাজিয়ে এ সংক্রান্ত আইন পাশ করালেও–এর একটি শব্দও বুর্জোয়া দলগুলো না মানতে পারে। না মানা তাদের স্বভাব। প্রতিশ্রুতি আর চুক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তাদের কাছে নেই। আবার যে বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণির আনুকূল্যে তারা ক্ষমতায় যান, সেই শ্রেণিটি বহাল থাকা পর্যন্ত তাদের পুঁজির নিশ্চয়তা দেয়ার আইনই সবচেয়ে কঠোরভাবে পালিত আইন, বাকি সব আইন গৌণ। ফলে সংবিধান সংশোধন কিংবা আইন প্রনয়ণ করে সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ কিছুটা ঠেকানো যায়, কিছু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের রাস্তা বের করা যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বামপন্থীরা প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি তুলেন। সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রাম জোরদার করতে হবে

তাই এদেশের মানুষের কাছে আমরা আহবান জানাচ্ছি, আপনারা এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ অনুসন্ধান করুন। কারণ অনুসন্ধান করলে এ কথা স্পষ্ট সামনে আসে যে, সংকটটা কোন দল বা ব্যক্তি তৈরি করেনি। সংকটটা তৈরি করেছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আসুন এই ব্যবস্থা পাল্টানোর লড়াই করি। একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানবসভ্যতাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির বদলে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিলো। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্টে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াই-ই আজ আমাদের প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে।

সাম্যবাদ
৮ম বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

গর্বাচেভের মৃত্যু সোভিয়েতের পতন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ মারা গেলেন। এই মৃত্যুর পর সংবাদমাধ্যমগুলোতে দেখা গেলো নানামুখী প্রতিক্রিয়া। কর্পোরেট মিডিয়াগুলোর ভাষায় গর্বাচেভ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে নাকি ব্যক্তির বিকাশের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। গর্বাচেভের নেতৃত্বেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ হয়। একইসাথে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সোভিয়েত রাষ্ট্র। তাই গর্বাচেভ কর্পোরেট মিডিয়ার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যে, ১৫টি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হলো তার জনগণ কী পেলেন? কেমন চর্চা চলছে মুক্তচিন্তার? ব্যক্তির বিকাশের কী অবস্থা? খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য সূচকগুলোর অবস্থা কী?

প্রাক্তন সোভিয়েতভুক্ত বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিচালিত দেশগুলোতে পতন পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়েছে। মানুষের দুরবস্থা বেড়েছে। এটা শুধু সোভিয়েতভুক্ত দেশের চিত্র নয়, পূর্ব ইউরোপের যেসকল দেশ আগে সমাজতান্ত্রিক ছিলো তাদের বেশিরভাগের চিত্র তাই।

অবশ্য এই সকল দেশের এই পরিণতির জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই দায়ী করা হয়। বলা হয়, পূর্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করার কারণেই নাকি বর্তমানের এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রচারের অধিনায়ক, পুঁজিবাদী পথে অর্থনীতি বিকাশের রোল মডেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী অবস্থা? সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সময় ১৯৯০-৯১ সালে আমেরিকায় বেকারত্বের হার ছিলো প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ। এই পরিস্থিতি উন্নতির দিকে এগোয়নি কখনোই। যুদ্ধ লাগিয়ে, অস্ত্র বিক্রি করেও আমেরিকার বেকারত্ব ঘুচানো যায়নি। এর পরিণতিতে ২০০৮ সালে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। ঘটে যায় 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট'। আমেরিকার পুঁজিপতিদের আখড়ার সামনে বসে খোদ আমেরিকার জনগণ বললেন, আমাদের দেশে ১ শতাংশ লোক ৯৯ শতাংশ লোককে বঞ্চিত করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে। বললেন, আমরা ৯৯ শতাংশের দলে।

আবার আমেরিকার শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ও বিভিন্ন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করেন এমন একদল মানুষও মনে করেন যে, গর্বাচেভ সোভিয়েতের জনগণকে একটা মুক্তির স্বাদ দিয়েছেন। তারা মনে করেন আমেরিকা এটাকে তার নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তারা সাম্রাজ্যবাদ স্বীকার করেন কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণকে ধরতে পারেন না। শ্রেণিশোষণ, শ্রেণিসংগ্রাম মানেন না। এই লিবারেল চিন্তার লোকেদের পরিচালিত মিডিয়াগুলো গর্বাচেভ বন্দনা ও আমেরিকার বিরুদ্ধতা দুই-ই করেছেন।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে অনেক লেখাও এই সময়ে এসেছে। সেখানে গর্বাচেভের ভূমিকার নিন্দা যেমন আছে, তেমনি আছে সোভিয়েত পতনের কারণ সম্পর্কিত আলোচনার চেষ্টা। এ সম্পর্কিত নির্মোহ আলোচনা খুবই জরুরী। কারণ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের গৌরবের দিন অস্বীকার না করলেও এই প্রশ্ন অনেকের মনেই এখন জন্ম নিয়েছে যে, এই বিরাট মহাযজ্ঞের আগুন নিজ থেকেই নিভে গেলো কেন? ভেতরের কোন প্রতিরোধ ছাড়াই কিভাবে সংঘটিত হলো এই প্রতিবিপ্লব?

সোভিয়েতের ভাঙন হঠাৎ করে হয়েছে, কিন্তু ভেতর থেকে সমাজতন্ত্র দুর্বল হচ্ছিলো দীর্ঘদিন ধরে এবং ধীরে ধীরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভেতরে পরিমাণগত পরিবর্তন যে ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিলো, সেই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ভূমিকা কী ছিলো? কোন বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ সে ব্যাপারে ছিলো কি? সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর সেই সম্পর্কিত সঠিক বিশ্লেষণগুলো কি শিক্ষা হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এসেছে? এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

গর্বাচেভের 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্ত': অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লবের চূড়ান্ত দলিল

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি মিটিংয়ে গর্বাচেভ তার 'পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত' এর পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তারপর ১৯৮৬ সালের ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে এবং ১৯৮৮ সালের ১৯তম 'অল ইউনিয়ন পার্টি কনফারেন্স' এর মধ্য দিয়ে তিনি ধাপে ধাপে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। এই সময়ের মধ্যে যতগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ও প্লেনারি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো হয় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই।

পেরেস্ত্রইকা বা পুনর্গঠন মানে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। এতে কেন্দ্রীভূত ও পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে তথাকথিত 'সেল্ফ ফিনান্সিং' ও 'সেল্ফ ম্যানেজমেন্ট' এর মাধ্যমে শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ 'অপারেশনাল অটোনমি' চালু করা হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলোকে সমবায় খামারে রূপান্তরিত করা হয়। এগুলোতেও 'সেল্ফ ফিনান্সিং' ও 'সেল্ফ ম্যানেজমেন্ট' চালু করা হয়। এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের হাতে জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রদান করা হয়। উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রোডাকশন ইউনিটগুলোর ম্যানেজারদের হাতে অর্পণ করা হয়। ম্যানেজারদের বাজার থেকে লিজ ও কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার দেয়া হয়। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকারও তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বলা হয়, উৎপাদনের নীতি নির্ধারণ করবে ম্যানেজাররা এবং তা নির্ধারিত হবে তাদের নিজস্ব প্রোডাকশন ইউনিটগুলোর উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে। এই উন্নতির মাপকাঠি হলো মুনাফা, সামাজিক কল্যাণ নয়। এভাবে, এককথায় সমগ্র অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই ম্যানেজার শ্রেণিই হচ্ছে সোভিয়েত সমাজের নতুন বুর্জোয়াশ্রেণি, যাদেরকে 'পেরেস্ত্রইকা'র মাধ্যমে সোভিয়েত অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ অধিকার আইনিভাবে প্রদান করা হয়।

অথচ পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের এই উদ্যোগ নেয়া হয় সমাজতন্ত্রকে অধিকতর সুদৃঢ় করার কথা বলতে বলতেই। এজন্য অর্থনীতিতে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক সংকটকে অজুহাত হিসেবে সামনে তুলে ধরা হয়। অথচ এই নৈরাজ্য সৃষ্টিই হয়েছিলো সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম চালু করার জন্য, পেরেস্ত্রইকা যার সবচেয়ে পরিণত সংস্করণ।

'গ্লাসনস্ত' অর্থাৎ 'খোলা হাওয়া' কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গর্বাচেভ তার ভাষ্যে সমাজতন্ত্রকে 'মানবিক মুখাবয়ব' দেন। যেন এর আগে সমাজতন্ত্র অমানবিক ছিলো। এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিশ্বের সমস্ত পঁচাগলা ভোগবাদী সংস্কৃতির আমদানি শুরু হয়। মস্কোতে সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, আরবাত স্ট্রিটে ব্রেক ডান্স শুরু হয়, স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করে তৈরি করা সিনেমার পরিচালক পুরস্কৃত হন। সমাজতন্ত্রবিরোধী সমস্ত চিন্তা ও সংস্কৃতির একপাক্ষিক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আর এর নাম দেয়া হয় 'মুক্ত হাওয়া'। যে বিষাক্ত হাওয়ার প্রবাহে পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনগণের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে প্রতিনিয়ত, সেই হাওয়া প্রবাহের দিকে সোভিয়েতের দরজা খুলে দেয়ার নাম হলো 'গ্লাসনস্ত'। এই খোলা হাওয়া সোভিয়েতবাসীর মনে ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির জন্য, তাদের ধনী হওয়ার কাল্পনিক স্বপ্ন তৈরি করার জন্য। তা না হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। একদিন যে সোভিয়েত জনগণ সবাইকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখতো, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা সৃষ্টির জন্য এই গ্লাসনস্ত। এককথায় গ্লাসনস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লব।

আধুনিক সংশোধনবাদ যেভাবে শুরু হলো

বিপ্লবের পর দেশকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য এক দীর্ঘ রাস্তা সোভিয়েত জনগণকে পাড়ি দিতে হয়েছিলো আর এই সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের শিল্পী ছিলেন মহান স্ট্যালিন। স্ট্যালিন অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত, দারিদ্রপীড়িত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

কিন্তু ক্রুশ্চেভ রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সমাজতন্ত্রের এক অদ্ভুত মানে করলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের মানে করলেন উৎপাদনের প্রাচুর্য। উৎপাদনের প্রাচুর্য যদি না থাকে, যদি সমাজতান্ত্রিক দেশের উৎপাদন পুঁজিবাদী দেশের পেছনে পড়ে থাকে তাহলে তাকে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলা যাবে? এই উৎপাদনের প্রাচুর্যের ধারণা তাকে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ ও লেবার ইনসেনটিভ দেয়ার দিকে নিয়ে গেলো। অথচ তিনি ধরতেই পারলেন না আমেরিকা থেকে মোট উৎপাদন কম থাকার পরও গোটা দুনিয়াকে কমিউনিস্টরা যে জয় করতে পেরেছিলো, তার শক্তি ছিলো ভিন্ন জায়গায়। চেতনার নিম্নমানের জন্য এই বুনিয়াদি বিষয়টি ধরতে না পারার কারণে চিন্তার ক্ষেত্রে তার বিচ্যুতি ঘটলো। চেতনার নিম্নমান যেমন হঠকারিতার জন্ম দেয়, তেমনি সংশোধনবাদেরও জন্ম দেয়। চেতনার এই নিম্নমানই ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম দিয়েছে। এই সংশোধনবাদ একদিকে ব্যক্তিগত ইনসেনটিভ দেয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী পুনরুজ্জীবনের সূচনা ঘটিয়েছে, অন্যদিকে এর ফলাফল হিসেবে চিন্তার ক্ষেত্রে এসেছে লিবারেলাইজেশন বা উদারনীতিবাদ।

আর এজন্য ক্রুশ্চেভকে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয়েছে। যে সংশোনবাদী রাস্তায় তারা হাঁটছিলেন তাতে চলতে গেলে স্ট্যালিনকে আক্রমণ না করলে চলে না। কারণ স্ট্যালিন এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলনীতিগুলোকে রক্ষা করেই অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন। যারা এর বাইরে যেতে চেয়েছেন, তাদের সাথে তিনি লড়াই করেছেন, তত্ত্বগতভাবে ও প্রায়োগিকভাবে তাদের মোকাবেলা করেছেন। একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু রাখতে গিয়ে কী কী সংকট মোকাবেলা করতে হয়, মূল্যের নিয়ম, পণ্য পরিবহন এসবের রূপ কী হবে এ সম্পর্কে স্ট্যালিনের স্পষ্ট বক্তব্য ছিলো।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও তাঁর সময়ে গৃহিত রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলোর সমালোচনা শুরু করা হয়। ঘৃণ্যভাবে তাঁকে আক্রমণ করা হয়। তাঁকে একজন স্বৈরতন্ত্রী একনায়করূপে সোভিয়েত জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীভূত ও পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়, লিবারম্যানের মতো অর্থনীতিবিদদের সামনে আনা হয়। তারা বলতে থাকেন যে, কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি অপ্রচলিত, নিয়ন্ত্রণমূলক ও আমলাতান্ত্রিক। তারা মুনাফাকে উৎপাদনের নিয়ামক হিসাবে নির্ধারণের উপর জোর দেন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের মেটেরিয়াল ইনসেনটিভ দেয়ার প্রথা চালু করার কথা বলতে থাকেন।

এর ফলে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও বাজার অর্থনীতিকে পুনঃপ্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাতে পুরাতন সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর অনিবার্য বিরোধ ঘটে। অর্থনীতি ধীরে ধীরে সংকটে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং অর্থনীতিতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার জন্ম হয়। ফলে গর্বাচেভ যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেন সেটি পরিকল্পিত এবং দীর্ঘদিন ধরে পুঁজিবাদী পথে হাঁটবার ফলাফল।

নেতৃত্বের ভুল নেতা কর্মীরা বুঝতে পারলো না কেন

এতবড় একটা মহান সংগ্রাম একজন নেতার কয়েকটা পদক্ষেপের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারেনা। প্রশ্ন আসে ক্রুশ্চেভের এই ভুল সোভিয়েত পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ বুঝতে পারলো না কেন?

এর প্রথম কারণ হচ্ছে পার্টির মধ্যে নেতা-কর্মীর যান্ত্রিক সম্পর্ক। পার্টিতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ছিলো না। নেতারা যা বলতেন কর্মীরা তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। এই চিন্তার প্রভাব শুধু সোভিয়েত পার্টিতে নয়, গোটা সাম্যবাদী শিবিরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সাম্যবাদী শিবিরের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি যা বলছেন, অন্যান্যরা তা কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকেই গ্রহণ করছেন। ফলে সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব যখন স্ট্যালিনের হাতে ছিলো তখন চিন্তার এই যান্ত্রিকতা পার্টি ও সাম্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে থাকলেও সেটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা সাম্যবাদী শিবিরকে বিপন্ন করেনি। কিন্তু যখন স্ট্যালিন অনুপস্থিত হলেন, তখন ক্রুশ্চেভের এই পদক্ষেপগুলোর উদ্দেশ্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বুঝতে না পেরে তাকে অন্ধভাবে অনুসরন করলেন। পরবর্তীতে এর বিষময় ফলাফল বর্তালো ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাব পড়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

এবছরের ১৩ সেপ্টেম্বর ইরানে ‘নৈতিকতা পুলিশ’ গ্রেপ্তার করেছিল মাশাহ আমিনি নামে ২২ বছর বয়সী একজন কুর্দি তরুণীকে, যিনি তাঁর ভাইয়ের সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুর্দিস্তান প্রদেশ থেকে তেহরানে এসেছিলেন। আমিনির মাথার স্কার্ফের নীচে কিছু চুল দৃশ্যমান থাকায় ইরানে প্রচলিত বাধ্যতামূলক হিজাব আইন ভঙ্গ করার ‘অপরাধ’-এ তাকে আটক করা হয়। একটি বিশেষ ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশি হেফাজতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনদিন পর ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। মৃত্যুর জন্য পুলিশ ও সরকার তাঁর পূর্বের অসুস্থতাজনিত হার্ট অ্যাটাককে দায়ী করেছে। আমিনির পরিবার দাবি করেছে– তিনি সুস্থ ছিলেন এবং পুলিশের নির্যাতনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদে ইরান জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এখনো চলমান। এই বিক্ষোভে শত শত নারী সমবেত হয়ে বাধ্যতামূলক হিজাব আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে জনসমক্ষে তাদের হিজাব ছুঁড়ে ফেলেছে, পুড়িয়েছে, অনেকে তাদের চুল কেটে ফেলেছে। বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিয়েছে– ‘নারী, জীবন, স্বাধীনতা’। অনেকে ইরানের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেইনীর কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান দাবি করেছে। নারী-পুরুষের মিলিত এই অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে অসংখ্য স্থানে পুলিশ বাধা দিয়েছে, দমন-সংঘর্ষ-গুলি-লাঠিচার্জ চলেছে, এ পর্যন্ত শতাধিক মৃত্যু ও সহস্রাধিক গ্রেপ্তার হয়েছে, সংকুচিত করা হয়েছে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিসেবা।

যে নৈতিকতা পুলিশের হাতে আমিনির মৃত্যু, ইরানে তাদের বলা হয় ‘গাশত-ই এরশাদ’ (গাইডেন্স পেট্রল)। এটি পুলিশেরই একটি বিশেষ ইউনিট, যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামিক নৈতিকতার সম্মান নিশ্চিত করার এবং পোশাকবিধি অনুসরণ না করা ব্যক্তিদের আটক করার। ২০০৫ সালে পুলিশের এই বিশেষায়িত বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামিক শরিয়ার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তৈরি করা আইনের অধীনে ইরানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যেকোন নারীকে জনসম্মুখে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের চুল ঢেকে (হিজাব বা মাথার স্কার্ফ দিয়ে) রাখতে হয় এবং লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হয়। আর তারই বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় নৈতিকতা পুলিশের ওপর। ইরানের ইসলামী সরকারের ভাষ্যমতে– ‘নৈতিকতা পুলিশ নারীদের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে। যদি নারীরা সঠিকভাবে পোশাক না পরে, তাহলে পুরুষরা উত্তেজিত হতে পারে এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে।’

বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মূল বক্তব্য– ‘এ আমার শরীর, এই শরীরে কী পোশাক আমি পরবো বা পরবো না, সেই সিদ্ধান্ত আমি নেব, অন্য কেউ নয়।’ এরা কিন্তু হিজাব জিনিসটা অর্থহীন এ কথা বলছেন না। কোনও মেয়েরই হিজাব পরা উচিত নয়, এ কথাও তারা বলছেন না। এরা ‘বাধ্যতামূলক’ ব্যাপারটিকে বিদায় করতে বলছেন। যার ইচ্ছে, সে হিজাব পরবে; যার ইচ্ছে নয়, সে পরবে না। তারা আরো বলছেন– নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন, মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। হিজাব-বোরখার আড়ালে ঢেকে বা গৃহবন্দী করে, পোশাক ও চলাফেরার স্বাধীনতা সংকুচিত করে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না। বাধ্যতামূলক হিজাবের পাশাপাশি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছেন তারা। ইরানে নারীদের শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ পেতে বাধা নেই, বরং শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এই শিক্ষিত ও সচেতন নারী-পুরুষরাই প্রধানতঃ আন্দোলন করছেন ধর্মের নামে জবরদস্তি বন্ধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে।

হিজাব বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে ইরানের নারীদের আন্দোলন নতুন কিছু নয়। ইসলামি বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ সালের মার্চেই নারীরা বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। সাম্প্রতিককালে ২০১৪ সালে ইরানের প্রবাসী সাংবাদিক মাসিহ আলিনেজাদ ‘আমার গোপন স্বাধীনতা’ নামে ফেসবুক পেইজ খুলেছিলেন। অনেক মেয়েরা রাস্তাঘাটে-দোকান-পাটে পাবলিকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে হিজাব খুলে ফটো তোলে, সেই ফটো ওই পেইজে পোস্ট করে। ২০১৭ সালে মাসিহ আলিনেজাদ আরেকটি আন্দোলন শুরু করেন, এবারেরটির নাম ‘সাদা বুধবার’। এবার তিনি মেয়েদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাধ্যতামূলক হিজাব আইনের বিরুদ্ধে সাদা রঙের হিজাব পরে আন্দোলন করার জন্য। ডিসেম্বর ২০১৭ নাগাদ হিজাব নিয়ে অনেক ধরনের প্রতিবাদ শুরু হয়। ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভিদা মভায়েদ নামে ৩১ বছর বয়সী এক তরুণী রাস্তার পাশে ইউটিলিটি বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে একটি লাঠির মাথায় পতাকার মতো উড়িয়ে দেন নিজের মাথা ঢাকার স্কার্ফ। তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, কয়েক সপ্তাহ পরে হাজত থেকে মুক্তি পান তিনি। মভায়েদের শান্তিপূর্ণ হিজাব-বিরোধী প্রতিবাদের পর আরও অনেক মেয়েই ইউটিলিটি বাক্সের ওপর বা কোনও উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে লাঠি বা গাছের ডালে বা কঞ্চিতে হিজাব বেঁধে পতাকার মতো উড়িয়েছেন। ২০১৮ সালের মার্চে ৪২ বছর বয়সী ইরানী নারী শাপারক সাজারিজাদেহকে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ
দশ দফা দাবিতে বাম জোটের সংবাদ সম্মেলন

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচনের পূর্বে সংসদ ভেঙে দেয়া ও নির্দলীয় তদারকি সরকার অধীনে নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে বাম জোটের সংবাদ সম্মেলন থেকে। গত ১১ অক্টোবর ২০২২ ঢাকার পল্টনস্থ মৈত্রী মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাম জোটের সমন্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুস সাত্তার, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পাটির কেন্দ্রীয় নেতা শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

দাবিসমূহ ঃ

১। বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার বা দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন নয়, নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারিক সরকারের অধীনে কালোটাকা, পেশীশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন দিতে হবে। নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও ঋণখেলাপী-ব্যাংক ডাকাত, অর্থপাচারকারী, কালাটোকার মালিক, দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা, না ভোটের বিধান ও প্রতিনিধি প্রত্যাহারসহ নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২। সংবিধানের দ্বিতীয় ও অষ্টম সংশোধনীসহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ইত্যাদি নিবর্তনমূলক ও অগণতান্ত্রিক সফল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। গণমাধ্যম ও বিচারবিভাগসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

৩। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দমন-পীড়ন, নির্যাতন ও গুম-খুন, ক্রসফায়ার, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ এবং গুম-খুন-নির্বিচার হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার করতে হবে। সভা-সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতালসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ অইনি করে বন্ধ করতে হবে।

৪। জ্বালানি তেলের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে। কালাবাজারি, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির মূল্যবৃদ্ধির অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। গাড়ি ও বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, আটা, পিঁয়াজসহ ৯টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বেসরকারি বাণিজ্য বন্ধ, টিসিবিকে কার্যকর করে রাষ্ট্রীয় সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সকল নাগরিকের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। গ্রাম-শহরের শ্রমজীবি ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে আর্মি রেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম সারা বছর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ বাগেরহাটের মংলা বন্দর এলাকায় বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে স্টিল ওয়ার্কারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চিনিকল চালুর দাবিতে বিভিন্ন চিনিকল এলাকায় আখচাষী ও চিনিকল শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জে ও পঞ্চগড়ে চিনিকলে শ্রমিকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫ অক্টোবর হবিগঞ্জে প্রায় ২ শত ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা আটক করার প্রতিবাদে ‘ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক ফেডারেশন’ হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি শফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ধনু মিয়ার নেতৃত্বে জেলার নেতৃবৃন্দ হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ।

সাম্যবাদ
৮ম বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাষ ঘোষের সাথে

বাসদ (মার্কসবাদী)'র মত বিনিময় সভা

বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের উদ্যোগে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা'র উপর পারস্পরিক চিন্তা ও মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ২০-২২ অক্টোবর, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ভারতের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) এর সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দলের সারাদেশের নির্ধারিত নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। বাসদ (মার্কসবাদী)-র সারাদেশের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে কমরেড প্রভাষ ঘোষ মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ভাববাদ, শ্রমিকশ্রেণির দল গড়ে তোলায় আজকের দিনের সংগ্রামে করণীয়, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামসহ বিপ্লবী জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন।

সভায় দুই দলের নেতৃবৃন্দ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বাম জোটের ১০ দফা

গ্রাম-শহর সর্বত্র চালু রাখতে হবে।

৫। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চুরি, দুর্নীতি, লুটপাটের হোতাদের সনাক্ত করে বিচারের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ, কালো টাকা ও খেলাপী ঋণ উদ্ধার করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতসহ উৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার-প্রশাসনের প্রভাব মুক্ত কার্যকরি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

৬। অবিলম্বে মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের মনুষ্যচিতভাবে বাঁচার মতো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বিশ হাজার টাকা নির্ধারণ ও মালিকানা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে আইন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তা ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বন্ধ সকল পাটকল, চিনিকল চালু করতে হবে। ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক চলাচলের নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করে লাইসেন্স দিতে হবে। চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করতে হবে। কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে হবে। ইউরিয়া সারের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার; হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে খাদে কৃষকের কাছ থেকে ফসল ক্রয় করতে হবে। আমূল ভূমি সংস্কার করতে হবে।

৭। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচার ও দায়ীদের শাস্তি দিতে হবে। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার, সংস্কৃতি রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

৮। শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি বাতিল করে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, বৈষম্যহীন ও একই ধারার গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নারী-শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন বিলোপে করতে হবে।

৯। জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করতে হবে। জালানিখাতে বিশেষ বিধান (দায়মুক্তি আইন) বাতিল করতে হবে। রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করতে হবে, বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি-লুটপাটের সাথে জড়িতদের বিচার করতে হবে। প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংসকারী ও ঝুকিপূর্ণ রামপাল, রূপপুর বিদ্যুত প্রকল্প বাতিল করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা রোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাপেক্স-পেট্রোবাংলার সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। ভোলার গ্যাস দ্রুত জাতীয় গ্রিডে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সৌদি আরব, চীন, রাশিয়া, জাপানসহ বিদেশিদের সাথে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক জনসম্মুখে প্রকাশ এবং দেশের স্বার্থবিরোধী সকল অসম চুক্তি বাতিল করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। সীমান্তে হত্যাকান্ড বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে ভারতকে চাপ দিতে হবে। রোহিঙ্গাদের ফেরৎ নেয়ার জন্য জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে হবে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে উসকানিমূলক হামলা বন্ধে জাতীয় ও আন্তজাতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বাধ্যতামূলক হিজাব

মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো বহিষ্কৃত হবার পর থেকেই আমেরিকা নানা অজুহাতে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখে। পরবর্তীতে 'ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে'– এই অভিযোগে এই অর্থনৈতিক অবরোধে সামিল হয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো। এইসব নিষেধাজ্ঞাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল– ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করে সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু করা এবং ইরানের জনগণকে অর্থনৈতিক দুর্দশায় ফেলে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলা।

কিন্তু সমৃদ্ধ তেলসম্পদ, দক্ষ জনশক্তি ও ইরানের জনগণের প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের ওপর ভর করে ইরান তার স্বাধীন অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পরবর্তী একমেরু বিশ্বে মার্কিনবিরোধী ভূমিকা নিয়ে এভাবে এতদিন টিকে থাকতে পারা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং ইরানীদের জাতীয় গৌরববোধ, দৃঢ়তা ও সক্ষমতার পরিচায়ক। সাম্প্রতিককালে জায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের হাতে নিপীড়িত প্যালেস্টাইনীদের প্রতি ইরানের ধারাবাহিক সমর্থন, মার্কিন মদদপুষ্ট ইসলামী উগ্রবাদী বিদ্রোহীদের দমনে রাশিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে সিরিয়ার বাশার-আল-আসাদ সরকারকে সামরিক সহযোগিতা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে মার্কিন-ইসরাইল-সৌদি চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাশিয়া ও চীনের সাথে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, ইয়েমেনে সৌদি-মার্কিনবিরোধী শিয়া হুতি বিদ্রোহীদের মদদ দেয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও প্যালেস্টাইনের হামাসকে সামরিক-অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি কারণে ইরানের প্রতি আমেরিকা আরো বেশি ক্রুদ্ধ ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইরাক-লিবিয়া-আফগানিস্তান-সিরিয়ার মত ইরানে সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালানোর মত সাহস আমেরিকা এখনো করে উঠতে পারেনি। যদিও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকা-ইসরাইল নানাভাবে ইরানের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত, গোয়েন্দা তৎপরতা, নেতৃস্থানীয় ইরানী বিজ্ঞানী ও সেনানায়কদের খুন ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

শাসক মৌলবাদী শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ইরানের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশে সহায়ক হলেও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও প্রকাশিত হয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ইরানের রাজনীতিতে 'রক্ষণশীল' ও 'উদারপন্থী'দের বিরোধের মধ্যে। ১৯৯৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উদারপন্থীদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ খাতামি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে ইরানে কিছু সংস্কারের চেষ্টা চালান। আবার ২০০৫ সালের নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রার্থী মাহমুদ আহমাদিনেজাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি এসব সংস্কার ও আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার রাশ টেনে ধরার চেষ্টা চালান। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারী অধিকারের দাবিতে সোচ্চার তরুণসমাজের ওপর নিপীড়ন জোরালো হয়। ২০০৯ সালের নির্বাচনে মোল্লাতন্ত্রের সমর্থনে আহমাদিনেজাদ ভোটে কারচুপি করে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার অভিযোগে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ২০১৩ সালের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও মধ্যপন্থী প্রার্থী হাসান রুহানি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি পারমাণবিক কর্মসূচি সংকুচিত করে পশ্চিমাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ইরানের ওপর চেপে থাকা অসহনীয় অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালান। অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে তিনি বিশ্বব্যাংক ও আইএম এফ-এর অনেক শর্ত মেনে জনকল্যাণমূলক খাতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি হ্রাস ও কিছু শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ করেন। ইরানের পুঁজিপতি শ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা এসব সংস্কারকে সমর্থন করে। ভর্তুকি হ্রাসের ফলে জ্বালানি ও জনজীবনে দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেলে ২০১৭ সালে এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। আবার ২০১৯ সালেও প্রবল সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নামে অর্থনৈতিক সংকটে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। এই পরিস্থিতির সুযোগে কট্টরপন্থীরা তাদের অবস্থান সংহত করে এবং ২০২১ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে রক্ষণশীল ইব্রাহিম রাইসি প্রেসিডেন্ট পদে বসেন। সাম্প্রতিক হিজাববিরোধী বিক্ষোভকারী প্রগতিশীলদের ওপর তার সরকার অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে 'সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা' খামেইনির অফিসের নির্দেশে। এভাবে পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণ ও ইসলামী মৌলবাদী শাসনের দ্বন্দ্ব ইরানে চলমান।

সাম্প্রতিক হিজাববিরোধী বিক্ষোভ ও নিপীড়নমূলক মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইরানি নারী ও যুবসমাজের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা থেকেই সৃষ্ট। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষের যেকোন মানুষ একে সমর্থন জানাবে ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু একে কাজে লাগিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও তাদের প্রচারমাধ্যম তাদের পুরনো 'শাসক পরিবর্তন' এজেন্ডা নিয়ে যেভাবে মাঠে নেমেছে, তার বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইরানে নারী অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য আজ মায়াকান্না কাঁদছে, তারাই আল কায়েদা-আইএস-তালেবানদের মত নারীবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে একসময় মদদ দিয়েছে। সৌদিসহ উপসাগরীয় আরব রাজতন্ত্রগুলো তাদের বন্ধু, প্যালেস্টইনী জনগণের ওপর 'জাতিগত নিধন' চালানো ইসরাইল রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। আসলে, তাদের উদ্দেশ্য– ইরানে অনুগত সরকার বসিয়ে সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠনের পুরনো আমল ফিরিয়ে আনা এবং মধ্যপ্রাচ্যে পরিপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করা। ইরানে কোন্ ধরণের শাসনব্যবস্থা থাকবে তা নির্ধারণের অধিকার ইরানের জনগণের, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের পথে নিজেদেরই লড়াই করে আদায় করতে হবে। সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের নৈতিক সমর্থন তাদের পাশে থাকবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বা সহযোগিতা ইরানের জনগণের বা নারীদের কোন কল্যাণ করবে না। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন ও পরবর্তীতে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হওয়ার পর মৌলবাদী তালেবানদের পুনরুত্থানে সেখানকার জনগণ ও নারীদের অবস্থা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা কমিটি গঠিত

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর ২০২২ শুক্রবার বিকাল ৩টায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও জেলা কমিটি পরিচিতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিরেন সিং-এর সভাপতিত্বে ও অজিত রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১ম পৃষ্ঠার পর

গর্বাচেভের মৃত্যু

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও বিশ্বসাম্যবাদী ব্যবস্থার উপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অভূতপূর্ব জয়, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অগ্রগতি ও তার নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান– এসব দেখে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তিও এসেছিলো। তারা শুধু বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আক্রমণ নিয়েই চিন্তিত ছিলেন। দলের ভেতরের সংগ্রামের উপর জোর দেননি। আদর্শগত চর্চাকে অবহেলা করেছেন। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ এসেছে ভেতর থেকে, যা শেষ পর্যন্ত দলের নিষ্ঠাবান নেতাকর্মীরা ঠেকাতে পারেননি।

বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের হুশিয়ারি

সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণিহীন সমাজ নয়। পুঁজিবাদ থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে যাওয়ার মধ্যবর্তী সমাজব্যবস্থা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ফলে এই সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্ব থাকে। ক্ষমতা হারানো পুঁজিপতি শ্রেণি এই ব্যবস্থার মধ্যেই তাদের মিত্রের সন্ধান করে, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে।

একটা দল বিপ্লব সংঘটিত করলেই দলের সকল সদস্য একটা ডিক্রি জারির মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও সংস্কৃতি, যেটা পুঁজিবাদী সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিগত চিন্তা ও ব্যক্তিগতভাবে বাঁচবার সংস্কৃতির বিপরীতে যৌথচিন্তা ও যৌথভাবে বাঁচবার সংস্কৃতি– সেটা রপ্ত করে ফেলে না। ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতেও পুঁজিবাদ বেঁচে থাকে ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের মধ্যে, মানুষের চিন্তাগত ক্ষেত্রে। এগুলোকে উস্কে দিয়ে পুঁজিবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করে। তাই উৎপাদন বিকাশের সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে আদর্শগত মানকে বিকশিত করতে হয়। নতুন নতুন যে সকল প্রশ্ন চিন্তাজগতে আসে তার উত্তর করতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ কাজ করে নিজে টিকে থাকার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উদ্দেশ্যই আমূল পাল্টে যায়। এখানে ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, মানুষ উৎপাদন করে সকলে মিলে ভালো থাকার জন্য। বর্ধিত উৎপাদন দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, শ্রমিকদের শ্রমঘন্টা কমে, তারা অর্থনৈতিক উৎপাদনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদনের সময় পায়।

আমরা যে বিষয়টায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাইছি সেটি হলো, গর্বাচেভের দুর্মতির কারণে এক মহান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটা দেশের রাতারাতি এমন পরিণতি হতে পারে না। গর্বাচেভ কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকেছেন। কিন্তু এর মৃত্যু হয়েছে ধীরে ধীরে। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম ও সমাজতন্ত্রবিরোধী অর্থনৈতিক সংস্কার পদক্ষেপ নেয়ার সময় বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরে অবস্থিত অন্যান্য দলগুলোর ভূমিকা কী ছিলো? এটা গভীরভাবে ভাবা দরকার।

সে সময়ে সমাজতন্ত্রের অভূতপূর্ব বিজয় সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শিবিরের মধ্যে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতির প্রভাব মারাত্মকভাবে পরিস্ফুট হচ্ছিলো। সোস্যালিস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিজমের নানা মাত্রার প্রভাব, জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্ধভাবে অনুসরনের মতো বিষয়গুলো কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করছিলো। দলের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অভাব, দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে সেসময় দেখা যাচ্ছিলো যখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের দরজায়। সেই সময়ে তুলনামূলক একটি ছোট পার্টি হলেও ভারতের এসইউসিআই দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্যবাদী শিবিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। যুগোস্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোকে কমিনফর্ম থেকে বহিস্কারের পটভূমিতে ১৯৪৮ সালে লিখিত এক নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, “. . .বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আর্কর্ষণ করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। . . . এই গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দেখা দেয়ার মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। এটা আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করে আসছি। . . . অর্থাৎ যেখানে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে এবং পার্টির সকল সদস্যের মধ্যে এবং নেতা ও কর্মীদের মধ্যে চিন্তার দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পথেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নেতৃত্ব গড়ে তোলার দরকার ছিলো, সেখানে বেশিরভাগ পার্টিই যান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছে, যা ফলস্বরূপ পার্টির শীর্ষে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে।

এই ঘটনা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। যার প্রমাণ যাওয়া যাবে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ভুল স্বীকারের মধ্যে; যেখানে তারা বলেছে যে, ৰিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও দৈনন্দিন সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছিলো, তা ভুল ছিলো ও তা সর্বহারার শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ছিলোনা। (এখানে ফ্রান্স, ইটালি, ভারত প্রভৃতি দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুপরিচিত ‘জনযুদ্ধ তত্ত্ব’ এর প্রয়োগ সম্পর্কে কমিনফর্মের একটি সভায় ঐসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বক্তব্য দ্রষ্টব্য)

. . .এতকাল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা সংগঠনের একপেশে রুটিন কাজের উপরই প্রধানত জোর দিয়ে এসেছেন, আদর্শগত চর্চার সাথে যুক্ত করে সংগঠন করার কাজকে একদম গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে নেতারা কর্মীদের শুধু দলের প্রতি দায়িত্ব ও শৃঙ্খলার কথা (যা যান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয়) এবং যে কোন উপায়েই হউক সংগঠন বাড়াবার কথাই বলেছেন। . . .কিন্তু আজ হিসাব-নিকাশের সময় উপস্থিত। . . .কারণ এতদিনে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন যে, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছ উপলব্ধি ছাড়া অনেকটা অন্ধের মতোই কর্মীরা অশেষ নির্যাতন ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে বিরাট সংগঠন গড়ে তুলেছেন, সেটা বহুলাংশেই শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে উঠেনি; যার ফলে তাঁদের পরিশ্রমের ফসলকে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি (গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অংশীদার লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা) আত্মসাৎ করতে সক্ষম হচ্ছে।”

কমরেড স্ট্যালিন নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের রিপোর্টই তার প্রমাণ। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে, “পার্টি এটা লক্ষ্য না করে পারে না যে, পার্টির কর্মী সংখ্যা দ্রুত বেড়ে ওঠার কতগুলো কুফল দেখা দিয়েছে–পার্টি কর্মীদের চেতনার মান কিছুটা নেমে গিয়েছে। . . .আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেগুলো প্রকাশ্যে টেনে আনা ও দূর করার উপায় হিসেবে আত্মসমালোচনা, বিশেষ করে নিচের তলা থেকে সমালোচনার প্রক্রিয়াকে যতদূর প্রসারিত করা যায়, তা পার্টি সংগঠনের সমস্ত স্তরে শুরু হয়নি। . . .পার্টি এটাও লক্ষ্য না করে পারে না যে, যেখানেই সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রক্রিয়াকে অবহেলা করা হয়েছে, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার কার্যকলাপের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ যেখানেই দুর্বল করা হয়েছে, ফলস্বরূপ সেখানেই অনিবার্যভাবে আমলাতান্ত্রিকতা, নানা ধরনের পচন প্রভৃতি কুৎসিত জিনিস মাথাচাড়া দিয়েছে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জনগণের সম্পর্ক এমনকি ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।”

দুঃখজনক হলো স্ট্যালিন এটা ধরতে পারলেও ১৯তম কংগ্রেস এর অল্পদিনের মধ্যেই স্ট্যালিন মারা যান। স্ট্যালিনের পর ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। এইসময় থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদী পথে হাঁটতে শুরু করে।

সোভিয়েতের পতন থেকে শিক্ষা নিতে হবে

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে না, বরং সংশোধনবাদী চর্চার পরিণতি কী সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছোট একটি নিবন্ধে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তোলা ভুল অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হলো। বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের প্রচারযন্ত্রে যেভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিষোদগার করা হয়েছে, একতরফা অপপ্রচার করা হয়েছে, মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে– সে সম্পর্কিত আলোচনা খুবই জরুরি। সমাজতন্ত্রের পতন থেকে শিক্ষা নিয়ে, আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে বামপন্থীরা সমাজতন্ত্রের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন–এবারের নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে গোটা বিশ্বের মেহনতি মানুষ এই প্রত্যাশাই করছে।

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বাধ্যতামূলক হিজাব

হিজাব না পড়তে চেয়ে প্রতিবাদ করায় ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ মোট ২০ বছরের সাজা দেওয়া হয়। সাজার ভয়ে তার আগেই তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ওই আন্দোলনে ৩০ জনেরও বেশি নারীকে জনসম্মুখে হিজাব খুলে প্রতিবাদ করার জন্য গ্রেফতার করা হয়।

চলতি ২০২২ সালের ১২ জুলাই ইরানে নারীরা একটি হিজাববিরোধী প্রচারণা শুরু করেছিলেন। এই প্রচারণায় নারীরা হিজাব ছাড়াই তাদের ভিডিও ঘঙ-এঙঙ-ঐওঔঅই হ্যাশট্যাগ দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এই হ্যাশট্যাগটি ইরানে শীর্ষ প্রবণতা ছিল এবং হাজার হাজার মহিলা হিজাব ছাড়া ছবি পোস্ট করেছেন। হিজাবের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের তারিখটিও ছিল বিশেষ। ১২ জুলাই ইরান হিজাব এবং সতীত্বের জাতীয় দিবস উদযাপন করে। এ সময় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে পুরো সপ্তাহে হিজাব প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ইরানের নারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই দিনে তারা হিজাবের বিরোধিতা করবেন। এই ঘটনার পর ১৫ আগস্ট হিজাব আইনে নতুন পরিবর্তন আনা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো নারী হিজাব ছাড়া ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হবে। সরকারি সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারাদণ্ড ১০ দিন থেকে ২ মাস পর্যন্ত হতে পারে। ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ ইরানি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং ৭৪ বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেওয়া হবে। পাশাপাশি, হিজাব না পরা মহিলাদের চিহ্নিত করতে ‘ফেসিয়াল রেকগনিশন’ প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান সরকার। অর্থাৎ জরিমানা, চাবুকের ভয় দেখিয়ে নারীদের জোর করে হিজাব পরতে বাধ্য করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে ইসলাম ধর্মের নামে মেয়েদের জবরদস্তি হিজাব বা বোরখা পরতে বাধ্য করা এবং নারীর চলাফেরা-শিক্ষা-কাজের অধিকার সংকুচিত করার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি তালেবানশাসিত আফগানিস্তান, আইএস-আলকায়েদা ইত্যাদি ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এবং সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের তথাকথিত মুসলিম দেশগুলোতে। তবে, ইরান কিন্তু আফগানিস্তানের মত পশ্চাদপদ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র নয়, বা সৌদি আরবের মত মার্কিন তাঁবেদার প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র নয়। ইরানে তরুণদের মধ্যে শিক্ষার হার প্রায় শতভাগ, শিক্ষার মানও উঁচু, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণাতে তারা বেশ অগ্রসর। ইরানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা ‘সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা’ ও ইসলামী মৌলবাদীদের নিয়ে গঠিত ‘অভিভাবক পরিষদ’-এর হাতে।

ইরানে ১৯৭৯ সালের ‘ইসলামী বিপ্লব’ ছিল মূলত অত্যাচারী রাজতন্ত্রবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনবিরোধী একটি গণঅভ্যুত্থান। ১৯৫৩ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইরানের জাতীয়তাবাদী ড. মোসাদ্দেক সরকারকে সিআইএ নিয়ন্ত্রিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় বসানো হয় নির্বাসিত রাজপরিবারের রেজা শাহ পাহলভিকে। মার্কিনীদের চোখে মোসাদ্দেক সরকারের ‘অপরাধ’ ছিল– তিনি ইরানের সমৃদ্ধ তেলসম্পদকে পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাত থেকে মুক্ত করে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই থেকে শাহ এর নেতৃত্বে ইরান কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোনীতে পর্যবসিত হয়। এর বিরুদ্ধে ইরানের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি, বামপন্থী ও ইসলামী দলগুলোর মিলিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালের শাহবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় এই সম্মিলিত ফ্রন্টের নেতৃত্ব হিসেবে সামনে চলে আসেন প্রবাসী ধর্মীয় নেতা রুহুল্লাহ খোমেইনী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলোর দোদুল্যমানতা এবং শক্তিশালী দুটি বামপন্থী দল মুজাহিদীন খালক ও তুদেহ পার্টির বিভ্রান্তির সুযোগে ইসলামী শক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। ১৯৭৯ সালের পরবর্তী কয়েক বছরে বামপন্থী ও মধ্যপন্থীদের হটিয়ে কট্টর ইসলামী মৌলবাদীরা তাদের ক্ষমতা সংহত করে এবং ইরানকে শরিয়াশাসিত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশ ও জাতীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের যে আকাঙ্খা ইরানের শক্তিশালী ধনিকশ্রেণী ও জনগণের ছিল তাকে ধারণ করে ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমা খবরদারির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কয়েকহাজার বছরের পারস্য সভ্যতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও শিয়া ধর্মতন্ত্রের মতাদর্শিক প্রভাব এক্ষেত্রে সহায়ক হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদের ওপর কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার আশংকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুরু থেকেই ইরানের নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এক্ষেত্রে ওই শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয় চরিত্র তাদের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল না। কারণ ওহাবিবাদী রাজতান্ত্রিক সৌদি আরব, ওসামা বিন লাদেনের উগ্রবাদী আল-কায়েদা ও আফগান ‘মুজাহিদ’রা ছিল আমেরিকার একসময়কার বন্ধু। দেশে দেশে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসকদের প্রতি মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতার কথাও সবাই জানেন। মূল সমস্যা ছিল ইরানের নতুন সরকারের জাতীয়তাবাদী চরিত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা। মার্কিন মদদে ও অস্ত্র সাহায্যে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ইরান আক্রমণ করেন। এই ইরাক-ইরান যুদ্ধ ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯৭৯ সালের পর ইরানের তেলক্ষেত্র থেকে **৫ম পৃষ্ঠায়**

সাম্যবাদ
৮ম বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

১ম পৃষ্ঠার পর

কসমেটিক উন্নয়ন

করার দম্ভোক্তি করতেন, আজকে তারাই জনগনকে কৃচ্ছতা সাধনের ছবক দিচ্ছেন। কিন্তু বিদ্যুতখাতে এহেন সংকটের কারণ কী?

সরকার বলছে, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ নাকি এই সংকটের কারণ। এ যুদ্ধের ফলে স্পট মার্কেট বা খোলাবাজারে এলএনজির দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। রিজার্ভ ঘাটতির কারণে সরকারকে এই এলএনজি কেনা বন্ধ করতে হচ্ছে। একই কারণে ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিও বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। সরকারের ভাষ্যে,এ জন্য ১ হাজার থেকে ১৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেবে। আর এই ঘাটতি দূর করা হবে পরিকল্পিত লোডশেডিং করে, অফিস টাইম পরিবর্তন করে, উৎসবে আলোকসজ্জা বন্ধ রেখে। সরকার তার ভুল জ্বালানী নীতির, জ্বালানী খাতে লুটপাটের সকল দায় চাপিয়ে দিচ্ছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের উপর। বাস্তব সত্যটা কী?

সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার ৫৬৪ মেগাওয়াট। আর গ্রাহক চাহিদা গরমকালে ১৪-১৫হাজার মেগাওয়াট আর শীতকালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। অর্থাৎ দেশে বিদ্যুতের যা চাহিদা, তার থেকে বেশি উৎপাদন ক্ষমতা আছে। তারপরও সংকট কেন?

সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে নামে-বেনামে রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। এর বেশিরভাগেই সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুতও উৎপাদন হয় না। কিন্তু প্রতি মাসে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ উল্টো এদের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। গত ১৫ বছরে কোন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াই সরকারকে ৭০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে অকার্যকর করে দিয়ে এই সব ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শুরু থেকেই আমাদের দলসহ অনেকেই এই টোটকা পদ্ধতি যে কতিয় ব্যবসায়ীদের লুটপাটের জন্য এবং এটি যে বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর হবে সে হুশিয়ারি দিয়েছিল। তেল-গ্যাস-বিদ্যুত-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি একটি বিকল্প জ্বালানী প্রস্তাবনাও দিয়েছিলো। কিন্তু বধির সরকার সেসব শোনেনি। সরকারের বেপরোয়া গোয়ার্তুমির মাশুল আজ জনগণকে দিতে হচ্ছে।

সরকার বিদ্যুখাতে একটি মহাপরিকল্পনা করেছে। এই মহাপরিকল্পনার মূলকথা হলো গোটা বিদ্যুৎখাতকে দেশি-বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া। ক্রমাগত বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো। যে কারণে সরকার সকল ধরণের সাংবিধানিক নিয়ম কানুনকে অমান্য করে দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। গত ১১ বছরে বিদ্যুতে পাইকারি দাম ১১৬ শতাংশ বাড়িয়েছে। দেশের ভেতরে গ্যাস মজুদ থাকার পরও গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধান বন্ধ রাখা হয়েছে। বাপেক্স-পেট্রোবাংলার সক্ষমতা না বাড়িয়ে দেশকে আমদানি নির্ভর করা হয়েছে। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজির মতো দামী গ্যাস আমদানির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে আজকের এই সংকট। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ একটা অজুহাত মাত্র। গত বছরে ডিজেল চালিত কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে শতকরা মাত্র ০.৭৬ শতাংশ। দেশের বাইরে থেকে এলএমজি আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, এ রকম কেন্দ্রের সংখ্যা মাত্র ১০টি এবং এই ১০টি বিদ্যুতকেন্দ্রই গত ৩ বছর ধরে বন্ধ। ফলে সরকার ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের যে যুক্তি হাজির করতে চাচ্ছে তার এক বর্ণও সত্য নয়।

এটা স্পষ্ট যে, বিদ্যুৎখাতের সংকট বাস্তবে সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতির কারণেই হয়েছে। সরকারের এই নীতিটি হলো, বিদ্যুতখাতের উদারিকরণ। নিজেদের সক্ষমতা তৈরি না করে আমদানি নির্ভরতা। আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শাসন ক্ষমতা রক্ষার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর সাথে গাঁটছড়া বাঁধে। এ ছাড়া তাদের আর কোন পথ নাই। অনেকেই বলেন, এটা সরকারের ভুল নীতি। যেন সরকার বুঝতে না পেরে এই নীতি গ্রহণ করেছে। তারা সরকারের ভুল নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেন। এর মধ্য দিয়ে সমস্যার প্রধান দিক থেকে জনগণের নজর সরিয়ে দেন। তাদের মধ্যে এ মোহ তৈরি করেন যে, সরকার ভুলনীতি সংশোধন ও দুর্নীতি নির্মূল করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিষয়টা মোটেও তেমন নয়। আসলে বর্তমান যুগটাই হলো বৃহৎ পুঁজির পরগাছাবৃত্তির যুগ। নব্য উদারিকরণ, দুর্নীতি, লুটপাট বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। তাই যেটাকে ভুলনীতি বলা হচ্ছে, সেটা শাসকদের ও বর্তমান সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে রূপ নিয়েছে। তাই এটা শাসকদের ভুল নীতি নয়, এটাই শাসকদের মূলনীতি। আর এর ফলেই শাসকরা আজ কোথাও শিল্পের বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী নয়। তারা লোক দেখানো বা অন্তসারশূন্য উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। এটাই খালেদ চাচাদের কাছে 'কসমেটিক উন্নয়ন'।

তাই আবেদন-নিবেদন করে তাদের ভুলনীতি সংশোধনের মোহ ছড়ানো সমাধান নয়। জনগণের শক্তিশালী আন্দোলনই শাসকদের বাধ্য করতে পারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতকে জনবান্ধব করতে। এ পথে অগ্রসর হওয়াই আজকের মূল কাজ। বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি বিকল্প প্রস্তাব রেখেছে অনেকদিন হয়। জাতীয় কমিটির এই প্রস্তাবকে কার্যকর করাতে হলেও আন্দোলনের বিকল্প নাই। আপনি কি করবেন? ভাবুন!

শেষ পৃষ্ঠার পর

৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন

ছাত্র ফ্রন্ট এ দেশে একমাত্র সংগঠন যারা শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে শুধু রাজনৈতিক দাবি হিসেবে নয়, একইসাথে সাংস্কৃতিক লড়াইও মনে করে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি আবেগঘনভাবে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মুবিবুল হায়দার চৌধুরীর কথা স্মরণ করেন। তার অমূল্য শিক্ষাকে স্মরণ করে তিনি বলেন,"কমরেড মুবিবুল হায়দার চৌধুরী আমাদের উদ্বুদ্ধ করতেন; বিপ্লবী রাজনীতির মহত্ব, গৌরব, আদর্শবোধ সম্পর্কে অমূল্য শিক্ষা রাখতেন। ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা লোক অল্প হতে পারো, এ নিয়ে ভেবো না। তোমরা যদি চরিত্র নিয়ে, আদর্শ নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যাও, ছাত্রদের কাছে যাও তবে সংগঠন একদিন বড় হবেই। একজন ছাত্রকে ভেতর থেকে পাল্টে দাও, তার সংস্কৃতিকে পাল্টে দাও। তা না করে, শুধু শিক্ষার দাবি নিয়ে লড়াই করলে হবে না। যে ছেলেটা নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মার্কস পাওয়ার জন্য শিক্ষকের পেছনে হাঁটে, যে ছেলেটা ছাত্র সংগঠনে পোস্ট পাওয়ার জন্য, কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য নীতি-নৈতিকতা বিক্রি করে– তাদের দিয়ে ছাত্র আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারবে না, গণআন্দোলনও গড়ে তুলতে পারবে না।'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বক্তব্য চলতে থাকে। এখন আর অপেক্ষার সুযোগ নেই, শুরু হবে র‍্যালি। র‍্যালির সামনে সংগঠনের পতাকা এবং মনীষীদের ছবি হাতে এগোতে থাকে অগ্রবর্তী দল। এরপর র‍্যালির মূল জমায়েত। মাইকে মাইকে স্লোগান চলছে, সবাই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এগুতে থাকে। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে র‍্যালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করতে থাকে। বৃষ্টির বেগ বাড়তে থাকে, র‍্যালিও এগোতে থাকে। শেষ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক চর্চা কেন্দ্রে গিয়ে।

এই র‍্যালি শুধু ভিড় নয়,সামনের দিনের লড়াইয়ের জন্য রসদ পাওয়ার তাগিদ। এরপর দুপুরের বিরতি। বেলা ৩ঃ৩০ টায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে শুরু হয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কমিটি পরিচিতি সভা। শুরুতেই সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বিভিন্ন জেলা গান-কবিতা -নাচ পরিবেশন করে। সিলেটের চা বাগানের বন্ধুরা এসেছে 'কাঠি নৃত্য' নিয়ে। ওরা এসেছে চা বাগানে বঞ্চিত মানুষদের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিতে। রংপুরের হরিজন পল্লীর বন্ধুরা পরিবেশন করে ভোজপুরি ভাষায় গান। গানের কথা অনেকের বুঝতে অসুবিধা হলেও ভাষার ব্যবধান কাটিয়ে সুরে ফুটে উঠেছে মুক্তির আকুতি।

এরপর আলোচনা পর্ব শুরু। শুরুতে আলোচনা করেন ভারতবর্ষের বিপ্লবী সংগঠন এআইডিএসও এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন,"বর্তমান বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদ আজ নিঃশেষিত। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে ফ্যাসিবাদী রূপ নিতেই হচ্ছে। এটা কোন বিশেষ দেশে নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশে। আন্তর্জাতিকভাবে আজ পুঁজিবাদ তার ফ্যাসিবাদী শাসনকে কায়েম করে সমস্ত জায়গায় নিপীড়ণ-অত্যাচার নামিয়ে আনছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের সবচাইতে ভয়ংকর দিক কোনটা? ফ্যাসিবাদ মানুষকে চিন্তা করতে ভুলিয়ে দেয়, মানুষের যুক্তিবাদকে মেরে দেয়, মানুষকে মানুষের কথা ভুলিয়ে দেয়। এই আক্রমণ আমাদের দেশেও চলছে। কিন্তু আপনাদেরকে এই ভরসা দিতে পারি যে, অত্যাচারী শাসকশ্রেণি আমাদের দেশে শেষ কথা বলবে না; মোদি-আম্বানিরা আমাদের দেশে শেষ কথা বলবে না। বিশ্বের কোন দেশেই শাসক শ্রেণি শেষ কথা বলেনি, অত্যাচারী শ্রেণি শেষ কথা বলেনি। মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে যদি চিন্তাকে ধ্বংস করে দেয়া যেতো তাহলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা স্পার্টাকাসের কথা বলতাম না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিংয়ের কথা স্মরণ করতাম না। মাথা ভেঙ্গে দিয়ে কখনো চিন্তাকে হত্যা করা যায় না। মানুষ বারবার মাথা তোলে, লড়াই করে। আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে লড়ছি। আপনারা বাংলাদেশে লড়ছেন। এ লড়াইয়ে আমরা পরস্পরের সাথী-সহযোগী। গোটা বিশ্বের পুঁজিপতিরা যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে নিপীড়ন নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বের শোষিত মানুষের- নিপীড়িত মানুষের ঐক্য আজ ভীষণ প্রয়োজন।'

অডিটোরিয়ামের সবাই গভীর মনোযোগের সাথে বক্তব্য শুনছে। বক্তব্যের কথাগুলো কত সহজ, প্রাঞ্জল কিন্তু কী গভীরভাবে মনে জায়গা করে নেয়! এরপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান। তিনি বলেন,"শিক্ষকরা আজ স্বাধীন ভূমিকা রাখতে পারছে না। কেউ বলছে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র কেউ বলছে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক একটা পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। যে রাষ্ট্র কাঠামো বিরাজ করছে সেখানে শুধু নিজের সুবিধা আদায় করতে গিয়ে শিক্ষকদের অধিকাংশ সরকারের তল্পিবাহক ছাড়া আর কিছুই না। এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে একজন শিক্ষক যখন ক্লাসরুমে যান, এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের উপরেও পড়ছে। এবং একজন শিক্ষার্থীরও এই ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আবাসিক হলে তারা যতই নাজেহাল হোক, নির্যাতনের শিকার হোক না কেন তারা পছন্দ করে 'বড় ভাইদের' সালাম দিতে; বিদ্রোহ করতে সাহস করে না।"

বাসদ (মার্কসবাদী) দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আপনারা জানেন। শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। গরীব-শ্রমজীবী মানুষের সন্তানরা যেন না পড়তে পারে তার আয়োজন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা হওয়ার কথা সেখানে শিক্ষকরা এসব বাদ দিয়ে প্রজেক্টের পেছনে, অর্থ আয়ের পেছনে ছুটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছে। যেখানে ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন করছে। মানুষ যেন শিক্ষা না পায় এজন্য শিক্ষা ব্যায় বাড়ানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে একজন যেন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে না পারে, 'ম্যান মেকিং, ক্যারেক্টার বিল্ডিং' এর শিক্ষা যেন না পায় পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তারই একটা নীল নকশা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০। এ কথা নিশ্চতভাবেই বলা যায়, এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যতটুকু জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিলো সেই দ্বারও বন্ধ হয়ে যাবে।"

এই সার্বিক সংকটকে তুলে ধরে তিনি উপস্থিত ছাত্রদের প্রতি আহ্বান রাখেন,"সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কাছে আমার আবেদন, উপস্থিত ছাত্র সমাজের কাছে আমার আবেদন, আসুন আমরা শপথ নিই; যেখানেই অন্যায় হবে, আমি একজন হলেও তার প্রতিবাদ করবো। প্রয়োজন হলে জেলে যাবো, প্রয়োজনে মরবো– কিন্তু চুপ করে থাকবো না। এই প্রতিশ্রুতি যদি আমরা তৈরি করি, সংগঠিত হই, আন্দোলন তৈরি করতে পারি তাহলে সেটাই ভবিষ্যত বাংলাদেশকে আলোর পথ দেখাবে।"

এরপর নব-নির্বাচিত কমিটিকে পরিচিত করাবার পালা। কমিটির নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কর্চসূচী শেষ। এবার ফেরার পালা। কিন্তু ফিরতে মন চায় না। রাঙ্গামাটির অয়ন, নোয়াখালীর রতন, রংপুরের বন্যা এরকম অনেকেই এসেছে প্রাণের টানে। অনেকেরই সামনে পরীক্ষা। আবার সম্মেলনের দিন বা পরদিন পরীক্ষা থাকায় অনেকেই উপস্থিত হতে পারেনি। তারাও সম্মেলনের সফলতা কামনা করেছে।

সম্মেলন তো একদিনের কর্মসূচী। কিন্তু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, এর আগে ছিলো প্রায় ৩ মাসের টানা প্রস্তুতি। রাত জেগে পোস্টার সাটানো, দেয়াল লিখন, ব্যানার টানানো। ক্লান্ত দেহ, চোখে ঘুম। তারপরও কি অদম্য উৎসাহ নিয়ে ওরা কাজগুলো করেছে। ভেতর থেকে তাগাদা ছিলো, সম্মেলনের বার্তা কত বেশি সংখ্যক ছাত্রের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়!

শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-চলচ্চিত্রকারসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ সম্মেলনের সফলতা কামনা করে বক্তব্য দিয়েছেন, ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন। পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আমেরিকা, কেনিয়ার বামপন্থী সংগঠন শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন।

এ সম্মেলন নিছক একটা কর্মসূচী নয়। সমাজের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে সত্যিকারের ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যেই এর যথার্থ তাৎপর্য। সম্মেলনে নেই বিশেষ সমারোহ, নেই বিশেষ জাঁকজমক। কিন্তু আছে লড়াইয়ে প্রচন্ড আকুতি। এই সম্মেলন বলে গেলো, বাংলাদেশের ছাত্ররা তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য। এই শক্তির অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না।

সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন

‘ছুঁড়বি যত বুলেট গুলি দ্বিগুণ তেজে বাড়বো মোরা বুকের রক্ত ঢালতে জানে বাংলাদেশের ছাত্ররা’

দ্বিগুণ তেজে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জড়ো হয়েছে। ওরা এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

উপলক্ষ্য ছিলো সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৬ষ্ঠ সম্মেলন সফল করা। কিন্তু আসল লক্ষ্য আরও বড়। শাসকশ্রেণির ধ্বংসের হাত থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে, শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

বেলা ১০ টা বাজতেই অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ স্লোগানে-স্লোগানে মুখরিত। ওদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ‘শিক্ষা কোন পণ্য নয়/শিক্ষা আমার অধিকার’, ‘শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব/রাষ্ট্রকে নিতে হবে’। একে একে বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিছিল সহযোগে মিলিত হচ্ছে সমাবেশ স্থলে। সকাল ১০:৩০ টায় সম্মেলনের উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হয়। এতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিগত কমিটির প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ। এরপর সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বন্ধুরা। তাদের গানে ভেসে আসছিলো মুক্তির সুর। এরপর সমাবেশ পরিচালনার জন্য মঞ্চে আসেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। তিনি অতীত দিনে যাদের লড়াই-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আজকের লড়াই করছে এবং আগামীদিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি মঞ্চে ডেকে নেন সম্মেলনের উদ্বোধক অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন ভারতের বিপ্লবী সংগঠন ‘অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক

স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন’ এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মনিশংকর পট্টনায়ক এবং সংগঠনের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্যকে। সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্য বলেন,“মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং এর আগে শহীদ রুমীর মত হাজারো তরুণ; আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মত অজস্র শিক্ষকরা পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিকে শিক্ষার অধিকার রক্ষা অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় দেশের শিক্ষকরা সেদিন জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আকাঙ্খা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিপরীতে দাঁড়িয়ে শাসক শ্রেণি ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করেছে; এদেশের গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এ পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সারা দেশব্যাপী শিক্ষার অধিকার রক্ষার লড়াই করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের ৬ষ্ঠ সম্মেলন।”

এরপর জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। একই সময় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সম্মেলন সমাবেশের সভাপতি ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন,“তরুণদের মধ্য থেকেই আসতে হবে সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দৃঢ়তা এবং যত ধরনের নিপীড়ন-বৈষম্য আছে তার বিরুদ্ধে সরব উচ্চারণের মনোভাবের। সেটা হোক যৌন নিপীড়ন, লিঙ্গীয় বৈষম্য কিংবা প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী তৎপরতার বিরুদ্ধে। নইলে বাংলাদেশের কোন ভবিষ্যৎ নাই। এই কাজে দরকার সংগঠিত ছাত্রশক্তি, সংগঠিত শিক্ষার্থীদের অংশ, তরুণদের সংগঠন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য, চিন্তার বিকাশের জন্য পাঠাগার থেকে শুরু করে মিছিল-সভা-সমাবেশ-প্রতিরোধ কর্মসূচী সব ধরনের কাজে এবং তার সাথে সৃজনশীল তৎপরতার মধ্যে তাদেরকে যুক্ত করতে হবে। নতুন রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার ভবিষ্যত গড়তে পারবে। আমি আশা করি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের লড়াই এবং অঙ্গীকারের যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেই এই বার্তা তরুণদের কাছে পৌঁছাতে পারবে। তরুণদের মধ্যে এই শক্তির ছোঁয়া দিতে পারবে।”

তাঁর এ বক্তব্য শুনে উপস্থিত ছাত্ররা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের জন্য। এরইমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস, আকাশে ঘন মেঘ। যে কোন মূহূর্তে শুরু হবে বৃষ্টিপাত। এরই মাঝে উদ্বোধনী সেশনের সমাপনী বক্তব্য রাখলেন জয়দীপ ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন,“সমাজতান্ত্রিক ৭ম পৃষ্ঠায়

বীরকন্যা প্রীতিলতার আত্মাহুতি দিবসে

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও আলোচনাসভা

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। মাস্টারদা সূর্যসেনের নির্দেশে ও বীরকন্যা প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবী-রা এই দিন ইংরেজ অফিসারদের বিনোদনস্থল পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। যে ক্লাবের গেটে লেখা ছিল-‘ভারতীয় ও কুকুরদের প্রবেশ নিষেধ’ (Indians and dogs are not allowed)। প্রীতিলতা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করতে যে, দেশের জন্য ভাইদের পাশাপশি বোনেরাও জীবন দিতে পারে। সেসময় ভাবা হতো, স্বদেশী আন্দোলনে নারীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে পারবে না। প্রীতিলতা আত্মাহুতি দিয়ে সেই চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করলেন। মৃত্যুর পর তাঁর শরীরে পাওয়া চিঠিতে ছিল, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের এগিয়ে আসার আহবান। পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ তৈরি করতে প্রীতিলতা নিজের জীবন দিয়েছেন। কিন্তু প্রীতিলতাসহ ব্রিটিশবিরোধী এ বিপ্লবীদের স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণে রাষ্ট্র ও নগর কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই। একদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধ অসীম সাহসে রুখে দাঁয়েছিলো ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্যসেন প্রীতিলতাসহ আরো কত নাম না জানা কিশোর তরুণ যুবক। আজ তাদের বড় দরকার এই দুঃসময়ে।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র নারী শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই করছে। অতীতে বড় বড় সংগ্রামী চরিত্রদের থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে নারীমুক্তির লড়াইকে বেগবান করার অংশ হিসেবে বীরকন্যা প্রীতিলতাকে স্মরণ করে। তার অংশ হিসেবেই গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার উদ্যোগে বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯০তম আত্মাহুতি স্মরণেপাহাড়তলীস্থ প্রীতিলতার ভাস্কর্যে পুস্পস্তবক অর্পণ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তৎকালীন ইউরোপিয়ান ক্লাব পরিদর্শন করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে প্রীতিলতা ভাস্কর্য চত্বরে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের আহবায়ক আসমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ সালমা রহমান,কলেজের সহকারি অধ্যাপক নিগার সুলতানা,নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সদস্য দীপা মজুমদার।

এসময় নারীমুক্তি কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ প্রীতিলতাসহ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও সঠিক ইতিহাস তরুণ সমাজের সামনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তুলে ধরা, তৎকালীন ইউরোপীয়ান ক্লাবকে ‘প্রীতিলতা জাদুঘর'-এ রূপান্তর, প্রীতিলতার জীবন ভিত্তিক বিভিন্ন সিনেমাতে ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করা, ঘরে - বাইরে, পাহাড়- সমতলে নারী ও শিশু নির্যাতন-ধর্ষণকারী এবং প্রশ্রয়দাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান,সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার - সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা - কুসংস্কার বন্ধ ও ইন্টারনেটে সকল পর্ণো ওয়েবসাইট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানান।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র পক্ষে শফিউদ্দিন কবির আবিদ কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, e-mail: mail@spbm.org